ভারতের ‘পলিসি’ বনাম বাংলাদেশের ‘মাস্টার প্ল্যান’

মওদুদ রহমান

মাত্র ছয় মাসের ব্যবধানে প্রতিবেশী দুই দেশের বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনাই বটে। তবে পার্থক্য হচ্ছে, ভারতে ‘ন্যাশনাল ইলেকট্রিসিটি প্ল্যান-২০১৬’-এর খসড়া প্রকাশিত হলো ১২তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ সেক্টরের হালহকিকত পর্যালোচনা করে দীর্ঘমেয়াদি ছক কাটার উদ্দেশ্যে। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ‘পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান-২০১৬’-এর খসড়া প্রকাশিত হলো ছয় বছর আগে চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া ‘পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান-২০১০’-এর বড় ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। তারপরও এতে অনেক কিছুই অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এবং অনুক্ত। বর্তমান লেখায় বাংলাদেশের মাস্টার প্ল্যান ও ভারতের পলিসির একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

কথায় আছে, হাকিম নড়ে তবু হুকুম নড়ে না। সেই কথা প্রমাণ করতেই যেন মনমোহন সিং সরকারের চূড়ান্ত করে যাওয়া পঞ্চবার্ষিক নীতির অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ সেক্টরের জন্য বেঁধে দেয়া লক্ষ্যমাত্রাগুলো পরিবর্তন না করে মোদি সরকার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা আরো বিকশিত করেছে। অথচ বাংলাদেশে একই সরকারের ধারাবাহিকতার মধ্যেও পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যানের (পিএসএমপি) ক্ষেত্রে হাকিমের হুকুম নড়ে গেল। আমদানি বাজার প্রসারিত করার নতুন পিএসএমপিতে বোধ হয় কোনো হাকিমদের হুকুমই প্রতিষ্ঠিত হলো।

উদ্দেশ্য কী?

সমতা আর সমৃদ্ধির ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করাই যে কোনো সেক্টরের মহাপরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য, অন্তত তা-ই হওয়া উচিত। একটা মাস্টার প্ল্যানের প্রকৃতি বুঝতে এর ‘অবজেকটিভ’ কিংবা ‘টার্মস অব রেফারেন্স’ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সদ্য প্রকাশিত বাংলাদেশের মাস্টার প্ল্যানের লক্ষ্য বেঁধে দেয়া হয়েছে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা। অর্থাৎ একটা রাজনৈতিক শ্লোগানকে জীবিত রাখতে টেকনিক্যাল মসলা দিয়ে পূরণের ব্যবস্থা! ‘ভিশন ২০৪১’ বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়ে যে রিপোর্ট শুরু হয়েছে, সেখানে প্রথম পরিকল্পনা হিসেবে এসেছে আমদানি করা জ্বালানির জোগান নির্বিঘ্ন করতে অবকাঠামো নির্মাণের ঘোষণা (দেখুন পিএসএমপি ২০১৬, খসড়া, বাংলাদেশ, পৃ. ১-২), অথচ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের তালিকায় স্বাভাবিকভাবেই থাকতে পারত সবার জন্য সার্বক্ষণিক সুলভ বিদ্যুৎ যোগানের কথা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের অধিকার সংরক্ষণের কথা।

প্রথম পরিকল্পনা হিসেবে এসেছে আমদানি করা জ্বালানির জোগান নির্বিঘ্ন করতে অবকাঠামো নির্মাণের ঘোষণা (দেখুন পিএসএমপি ২০১৬, খসড়া, বাংলাদেশ, পৃ. ১-২), অথচ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের তালিকায় স্বাভাবিকভাবেই থাকতে পারত সবার জন্য সার্বক্ষণিক সুলভ বিদ্যুৎ জোগানের কথা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের অধিকার সংরক্ষণের কথা।

ভারতের ন্যাশনাল ইলেকট্রিসিটি প্ল্যান-২০১৬ (এনইপি) এর খসড়ার প্রথম অধ্যায়ে এ লক্ষ্যমাত্রাগুলোই নির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে (দেখুন এনইপি-২০১৬, খসড়া, ভারত, পৃ. ১-২)। ওই রিপোর্টে সুনির্দিষ্টভাবে সবার জন্য ২৪ ঘণ্টার বিদ্যুৎ নিশ্চিত করে ভবিষ্যতে কী পরিমাণ চাহিদা হবে সেটার হিসাব কষে বিভিন্ন উৎস থেকে কিভাবে মেটানো যায় তা উল্লেখ করা হয়েছে। আর বাংলাদেশের পিএসএমপিতে আমদানি অবকাঠামো তৈরির কথা বলা হয়েছে, মেগা প্রকল্পের বিদ্যুৎ প্লান্ট বসিয়ে ফেলার পরিকল্পনার ছক কাটা হয়েছে। কিন্তু সেই বিদ্যুৎ সর্বজনের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকবে কি থাকবে না, ঘনবসতির একটা দেশে শিল্পায়নের প্রকৃতি শ্রমঘন না হয়ে কেন পুঁজিঘন হবে, কৃষকদের সেচ পাম্পের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী থাকবে কি না, সে বিষয়গুলো পরিষ্কার করা হয়নি।

বিপরীতে ভারতের এনইপিতে বিদ্যুতের সুলভ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ‘লাইফ লাইন’ রাখার কথা বলা হয়েছে। আর বাংলাদেশের পিএসএমপিতে আমদানি করা উচ্চমূল্যের এলপিজি ও এলএনজির দাম সহনীয় করতে গ্যাসের দাম বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে, ভর্তুকি প্রত্যাহারের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ভারতের এনইপিতে পরিকল্পনার ধারাবাহিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২২ সালের মধ্যেই কৃষিক্ষেত্রে বছরপ্রতি ৫.৬ বিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশে সেচ পাম্পে ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ খরচের হিসাবে উচ্চ কর্মদক্ষতা নিশ্চিত করার এই কার্যক্রমের কারণে সেখানে কৃষকদের বছরপ্রতি সাশ্রয়ের হার ২০২২ সালে বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। কোনটা বেশি? কোনটা কম? বিচার হলো কীভাবে?

বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ভবিষ্যৎ যোগান নির্ধারণ যে কোনো মাস্টারপ্ল্যানের অন্যতম উদ্দেশ্য। এর সাথে জড়িয়ে থাকে বর্তমান অর্থনীতি, ভবিষ্যৎ আমদানি-রপ্তানির গতি-প্রকৃতি, শিল্পায়নের ধরন আর সর্বসাধারণের ব্যবহার অভ্যস্ততা। এমন একটা জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত কোনো ঘোষণামুখী হলে চলে না, হতে হয় বাস্তবভিত্তিক। আর উপযুক্ত জ্বালানির ক্রম বাছাই পছন্দসই মাপকাঠির ভিত্তিতে হলে হয় না, হতে হয় সামগ্রিক। কিন্তু বাংলাদেশের মাস্টারপ্ল্যানে এটিকে শুধুমাত্র দায়সারাভাবেই করা হয়নি, বরং একটু খতিয়ে দেখলে মনে হতে পারে যে পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখা অনেক কিছুর হিসাব মেলাতে ইচ্ছেমতো অঙ্ক কষা হয়েছে!

পিএসএমপি-২০১৬-তে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে থ্রি-ই (3E)। প্রথম প্রশ্ন–এটা শুধুমাত্র থ্রি-ই কেন? অর্থাৎ কেবল অর্থনীতি (Economy), পরিবেশ (Environment), আর জ্বালানি নিরাপত্তা (Energy Security) হিসাবে নেয়া হলো কেন? ধরা যাক, অর্থনীতির আকার বাড়ল, জিডিপি বাড়ল লাফিয়ে লাফিয়ে, কিন্তু ধনী-গরিব বৈষম্য প্রকট হলো, মানব উন্নয়ন সূচকের অবনতি হলো (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের চেয়ে মাথাপিছু কম পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করেও শ্রীলঙ্কা ২০১৫ সালে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে মানব উন্নয়ন সূচকে ৭৩তম আর ভারত ১৩০তম)–এমন গোষ্ঠীস্বার্থকেন্দ্রিক ‘উন্নয়ন’ আমরা চাই কি না[১]? এই থ্রি-ই পদ্ধতিতে জ্বালানি নিরাপত্তাকে মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় যে এটা কোন ধরনের জ্বালানি নিরাপত্তা? এটা কি

বৈশ্বিক বাজার থেকে ভবিষ্যৎ জ্বালানি পাবার নিরাপত্তা? যদি তা-ই হয় তাহলে প্রশ্ন আসে, এ ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যে দীর্ঘমেয়াদি সমঝোতা চুক্তিগুলো করতে হয়, সেই চুক্তিগুলো কি হয়ে গেছে? চুক্তির শর্ত কী? জ্বালানির দাম কত? আর যদি দেশীয় উৎস থেকেই চাহিদা মেটানোর কথা ধরে নেয়া হয় তাহলে সেটা কোন উৎস? এই দেশীয় জ্বালানি সংস্থানের আয়োজন কোথায়? অগ্রগতি কতটা?

ছক-১: ২০১২ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে ভারতে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন

উৎস	২০১২ সালে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (৩১/০৩/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত)	সামগ্রিক উৎপাদন
সৌর	১০০০০	৫৮২৩	৬৭৬২.৮৫
বায়ু	১৫০০০	৯৫০৯	২৬৮৬৬
বায়োমাসভিত্তিক বিদ্যুৎ	৫০০০	১৭১৯	৪৯৪৬.৪১
ছোট আকারে জলবিদ্যুৎ		৮৭৯	৪২৭৩.৪৭
মোট	৩০০০০	১৭৯৩০	৪২৮৪৮.৭৩

উৎস: এনইপি ২০১৬, খসড়া, ভারত, পৃঃ ২.১৭

এই জ্বালানি নিরাপত্তা শব্দটা আবার অর্থের ব্যাপ্তিতে অনেক বিষয় ধারণ করে। যেমন, কার জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা? এটা কী শুধু ইপিজেড ভিত্তিক রপ্তানিমুখী শিল্পের জ্বালানি নিরাপত্তা, নাকি এর মধ্যে দেশীয় ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তারাও অন্তর্ভুক্ত? এটা কী শুধু সামর্থ্যবানদের জ্বালানি নিরাপত্তা, নাকি 'দিন আনে দিন খায়' মানুষরাও এর অন্তর্ভুক্ত? এটা কী শুধু ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা শপিং মলগুলোর জ্বালানি নিরাপত্তা, নাকি এর মধ্যে লোডশেডিংয়ে নাকাল কৃষকও অন্তর্ভুক্ত? প্রশ্ন অনেক। কিন্তু একটা দেশের পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান এই প্রশ্নগুলো এড়িয়ে কি করে হতে পারে!

এটা কী শুধু ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা শপিং মলগুলোর জ্বালানি নিরাপত্তা, নাকি এর মধ্যে লোডশেডিংয়ে নাকাল কৃষকও অন্তর্ভুক্ত? প্রশ্ন অনেক। কিন্তু একটা দেশের পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান এই প্রশ্নগুলো এড়িয়ে কী করে হতে পারে!

তাই খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন যে থ্রি-ই সূচক কোন উদ্দেশ্যে বেছে নেয়া হলো? এটা কেন ক্রয়ক্ষমতা (Purchasing Power), জনসাধারণের সম্মতি (People's Acceptance) অন্তর্ভুক্ত করে 3E-2P হলো না? কেন 3E-তেই আটকে থাকতে হলো? কেন অগ্রাধিকার ক্রমগুলো ঝালিয়ে নিয়ে এএইচপি (AHP) পদ্ধতি ব্যবহার করা হলো না? এতসব খুঁত নিয়ে যে মাস্টারপ্ল্যানের ভিত্তি সাজানো হয়েছে, গ্যাসভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থাকে ৩৫ শতাংশ এবং কয়লাভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থাকে ৩৫ শতাংশ ধরে যে অগ্রাধিকার ক্রম তৈরি করা হয়েছে, সেটিকে কেউ বাতিল করে দিতে চাইলে খুব বেশি দোষ দেয়া যাবে কি?

নবায়নযোগ্য জ্বালানির সংজ্ঞা কোনটা?

পিএসএমপি ২০১৬-তে নবায়নযোগ্য জ্বালানির নতুন সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে! কমতে থাকা জীবাশ্ম জ্বালানি রিজার্ভের দেশে নিরাপত্তার আয়োজনে যে জ্বালানি খরচবিহীন অবস্থায়, আপাত নিরাপদ, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ চাহিদা মেটায়, সেটা সবুজ জ্বালানি কিংবা নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস বলে বিবেচিত হলেও এখানে বড় অঙ্কের সংখ্যা দেখাতে বাঁধভিত্তিক জলবিদ্যুৎ আর আমদানি করা বিদ্যুৎকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আগে ২০১৫ সালের মধ্যেই ৫ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক ব্যবস্থায় গড়ে তোলার কথা উল্লেখ করা হলেও ২০১৬-এর শেষ ভাগে এসেও তা রয়ে গেছে ২ শতাংশেরও কম। কেন পূর্বঘোষিত এই পরিকল্পনাগুলো চরমভাবে ব্যর্থ হলো, কেন জ্বালানি মন্ত্রণালয়, স্রেডা (SREDA), ইডকল (IDCOL) শত কোটি টাকা খরচেও কোনো ফল নিয়ে আসতে পারল না, সেটার কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এখানে নেই। অথচ ভারতের এনইপিতে পূর্বঘোষিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা কোন খাত থেকে কিভাবে কতটুকু পূরণ হলো এবং কতটুকু কী কারণে পূরণ করা গেল না, সেটার বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে। বিপরীতে বাংলাদেশের পিএসএমপিতে ব্যর্থ সিস্টেমের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই ২০২১ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের পুনর্ঘোষণা দেয়া হয়েছে। জবাবদিহিহীন এই রাজত্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি অন্বেষণের চেষ্টা যে আসছে বছরগুলোতেও 'কাজির গরু'ই হয়ে থাকবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অন্যদিকে ভারতে ১২তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার পর্যালোচনা এনইপিতে নিচের টেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পিএসএমপিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে সম্ভাব্যতার যে হিসাব দেখানো হয়েছে তা অসংখ্য প্রশ্নে জর্জরিত। এখানে উপকূলীয় এলাকায় সাগরের বুকে বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভাব্যতার হিসাব নেই কেন? বাতাসের গতি বিবেচনায় কত উচ্চতায় নেয়া উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে? যদি প্রদত্ত তালিকাটি তৈরির সময় কোনো অসম্পূর্ণতা থাকে তাহলে সেটি কেন আড়াল করা হয়েছে?

পিএসএমপিতে সৌরবিদ্যুতের সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে ২৬৪০ মেগাওয়াট। অথচ ২০১৬ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে এই সম্ভাবনা ৫ হাজার মেগাওয়াট[২]। বায়ুবিদ্যুতের

সম্ভাবনা উল্লেখের ক্ষেত্রে 'উইন্ড ম্যাপ' না থাকার কথা ওই গবেষণায় বলা হয়েছে। অথচ কিসের ভিত্তিতে পিএসএমপিতে বায়ুবিদ্যুতের সম্ভাবনা ৬৩৭ মেগাওয়াট হিসেবে দেখানো হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি। বায়োমাস-বায়োগ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা দেখানো হয়েছে মাত্র ২৮৫ মেগাওয়াট, অথচ প্রকাশিত গবেষণা থেকে জানা যায় যে এর সম্ভাবনা ১২০০ মেগাওয়াট। মিনি, মাইক্রো, টাইডাল বিদ্যুতের সম্ভাব্যতা মাত্র ৬০ মেগাওয়াট হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ গবেষণা প্রবন্ধ বলছে, এই সম্ভাব্যতা কমপক্ষে ২০৫ মেগাওয়াট।

এই বিতর্কিত হিসাবগুলো মূল রিপোর্ট প্রকাশের সময় সংশোধিত হবে বলে আশা করাই যায়। কিন্তু নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে নাক সিটকানো রিপোর্টে গোঁজামিলগুলো সংশোধন করা হবে না বলেই মনে হচ্ছে।

কয়লার ব্যবহার কতটা? কীভাবে?

বড়পুকুরিয়ার একমাত্র কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি চলছে ভূগর্ভস্থ উপায়ে কয়লা আহরণ করে। এর উৎপাদনক্ষমতা ২৫০ মেগাওয়াট হলেও চলছে ২০০ মেগাওয়াটেরও কম সক্ষমতায়। আর ফুলবাড়ী গণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে খুব সহজেই বলে দেয়া যায় যে কৃষিজমি আর পানিসম্পদ নষ্ট করা উন্মুক্ত পদ্ধতির কয়লাখনি বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য হবে না। সরকারের গঠন করে দেয়া তিন কমিটিই (নূরুল ইসলাম কমিটি, ২০০৬; পাটোয়ারী কমিটি, ২০০৭-০৮; মোশাররফ কমিটি, ২০১১-১২) উন্মুক্ত কয়লাখনির ভয়াবহতা বর্ণনা করে রিপোর্ট দিয়েছে।

২০৩০ সালের মধ্যে যে প্রায় ১০ হাজার মেগাওয়াট আর ২০৪১ সালের মধ্যে যে প্রায় ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কয়লা দিয়ে উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে, সেখানে জমির জোগাড় কিভাবে হবে, পানির ব্যবহার কতটা হবে, কয়লার মান কেমন হবে, দূষণ নিঃসরণ কে মনিটর করবে–সে বিষয়ে কিছুমাত্র উল্লেখ করা হয়নি। অথচ ভারতের 'এনইপি'র খসড়ায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিঃসরণ মান বেঁধে দেয়া হয়েছে। পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরোপ করা হয়েছে কড়াকড়ি।

কিন্তু জনমত আর বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষণে চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া অবস্থান পাল্টানোর জোর চেষ্টা পিএসএমপিতে খুব প্রকটভাবে উঠে এসেছে।

২০৩০ সালের মধ্যেই ৬২০০ মেগাওয়াট আর ২০৪১ সালের মধ্যে ১১,২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ কয়লার উৎস ব্যবহার করেই চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে যে প্রায় ১০ হাজার মেগাওয়াট আর ২০৪১ সালের মধ্যে যে প্রায় ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কয়লা দিয়ে উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে, সেখানে জমির জোগাড় কীভাবে হবে, পানির ব্যবহার কতটা হবে, কয়লার মান কেমন হবে, দূষণ নিঃসরণ কে মনিটর করবে–সে বিষয়ে কিছুমাত্র উল্লেখ করা হয়নি।

অথচ ভারতের 'এনইপি'র খসড়ায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিঃসরণ মান বেঁধে দেয়া হয়েছে। পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরোপ করা হয়েছে কড়াকড়ি।

ভারতের এনইপির ৩৭৫ পৃষ্ঠার খসড়ায় এসব কিছু বিস্তারিত উল্লেখ করা গেছে আর বাংলাদেশের পিএসএমপির ৭৬০ পৃষ্ঠার খসড়ায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি জায়গার অভাবে উল্লেখ করা যায়নি বলে তো পার পাওয়া যাবে না।

পিএসএমপি-২০১০ এর চূড়ান্ত রিপোর্টে কিন্তু তেলভিত্তিক উৎপাদন ৫ শতাংশের বেশি হবে না বলে লক্ষ্য বেঁধে দেয়া ছিল। অথচ বর্তমানে এটি উৎপাদনব্যবস্থার ২৯ শতাংশ দখল করে নিয়েছে[৩]।

ছক-২: এনইপিতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর জন্য উল্লিখিত মানদণ্ড

নিঃসরণ	মান	
ক্ষুদ্রকণা (Particulate Matter)	৩০ মি.গ্রা./ঘনমিটার	১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে নির্মাণকাজ শুরু হতে যাওয়া কেন্দ্রগুলোর জন্য মান
সালফার ডাই-অক্সাইড	১০০ মি.গ্রা./ঘনমিটার	
নাইট্রোজেন অক্সাইড	১০০ মি.গ্রা./ঘনমিটার	
পানির ব্যবহার	সকল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রতি মেগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ তৈরিতে সর্বোচ্চ ৩.৫ ঘনমিটার পানি ব্যবহার করা যাবে	
	১ জানুয়ারী ২০১৭ থেকে নির্মাণকাজ শুরু করতে যাওয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতি মেগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ তৈরিতে সর্বোচ্চ ২.৫ ঘনমিটার পানি ব্যবহার করা যাবে। সেই সাথে পানি ব্যবহারে শূন্য নির্গমন নীতি মেনে চলতে হবে	

রেন্টাল-কুইক রেন্টাল তেলভিত্তিক বেসরকারি উৎপাদন ব্যবস্থায় সরকার জলের মতো টাকা ঢালছে আর অন্যদিকে তেল আমদানি সরকারের হাত থেকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ায় সস্তা তেল আমদানি করে উচ্চমূল্যে বিক্রির নতুন ব্যবসা শুরু হয়েছে। তেলভিত্তিক উচ্চমূল্যের বিদ্যুতের কারণে দাম সমন্বয়ের নামে বাড়ানো হচ্ছে বিদ্যুতের দাম। তাই এই খসড়া নীতিতে যখন পরিষ্কারভাবেই উচ্চমূল্যের আমদানি করা এলএনজির সাথে দাম সমন্বয় করতে কোনো প্রকার রাখঢাক না করে গ্যাসের দাম বাড়ানোর সুপারিশ করা হয় তখন আর আমরা অবাক হই না। নিজেদের সক্ষমতার দিকে না তাকিয়ে এডিবি, আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, জাইকার পরামর্শে বিশেষ কোনো মডেলের অন্ধ অনুকরণ করলে যা হওয়ার কথা এ পর্যন্ত তা-ই হয়েছে, দিন দিন পরিস্থিতি আরো খারাপ হচ্ছে।

আমদানিনির্ভর হয়ে গড়ে ওঠার প্রেসক্রিপশন বহাল থাকলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ আসছে দিনে সর্বজনের সামর্থ্যের মধ্যে যে থাকবে না তা নিশ্চিত বলার যথেষ্ট কারণ আছে।

মওদুদ রহমান: প্রকৌশলী ও জ্বালানী গবেষক।
ইমেইল: mowdudur@gmail.com

তথ্যসূত্র:

[1] UNDP Human Development Index Report, 2015 http://hdr.undp.org/en/composite/HDI

[2] Ershad U.K. and Andrew R.M., Review of biogas digester technology in rural Bangladesh, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 62, 247–259 ,2016

[3]<http://www.bpdb.gov.bd/bpdb/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=16>, accessed on 24 December, 2016